# বাংলাদেশ: নিরাপত্তা বাহিনীর আইনী-পরিণতি বিহীন হত্যা-নির্যাতন

*নতুন সরকারকে তার মানবাধিকার সম্পর্কিত অঙ্গিকার মাথায় রেখে ইমপিউনিটি বা "শাস্তি থেকে অব্যাহতি" দেয়ার বিষয়টির ওপর মনোযোগ দিতে হবে।*

(নিউ ইয়র্ক, মে ২৮, ২০০৯) হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, তাদের আজকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেছে, আইনের শাসন বাস্তবায়ন ও "শাস্তি থেকে অব্যাহতি" দেয়ার মানবাধিকার পরিপন্থী রীতি বন্ধের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।

বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক সরকার আইন-রক্ষাকারী কর্মকর্তা ও সেনা-সদস্যের দ্বারা মানবাধিকার লংঘনকে আইনের আওতায় আনার অঙ্গীকার করলেও কখনোই তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

"হত্যা ও নির্যাতনকে অবজ্ঞা : বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী কে ইমপিউনিটি প্রদান" নামের এই ৭৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে সামরিক-আধা-সামরিক কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যদের তথাকথিত "ক্রসফায়ার", নিরাপত্যা হেফাজতে হত্যা, নির্যাতন, "অন্তর্ধান" ও বিধিবহির্ভুত গ্রেফতারে জড়িত থাকার কথা বলা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু ঘটনা, যেখানে দায়ী ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করা হয়নি, তাও এই প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে পর্যালোচিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত হুমকি, হয়রানি এমনকি শারীরিক প্রহারের মুখে, ভুক্তভোগী ও তার পরিবার বাধ্য হয়েছেন আইনের শাসন পাওয়ার চেষ্টা ও আশা পরিত্যাগ করতে। যার ফলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা নিরাপত্তা বাহিনী ও চাকরিতে এখনো বহাল আছেন। "আপনি যদি সামরিক কর্মকর্তা, র‍্যাব বা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য, অথবা পুলিশ অফিসার হয়ে থাকেন, তাহলে বাংলাদেশে আপনি খুন করেও পার পেয়ে যেতে পারেন", বলেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর এশিয়া আঞ্চলিক পরিচালক ব্র্যাড এ্যাডামস। তিনি আরো বলেন, "যারা হত্যা ও নির্যাতন করে, তাদের অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সাথে জেলখানায় থাকা উচিৎ।"

গত পাঁচ বছরে, মিলিটারি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), যা একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অপরাধ নির্মূল বাহিনী এবং পুলিশকে সহস্রাধিক হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী করা হয়। বহু দিন ধরেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অন্যান্যরা বলে আসছে এসব মৃত্যুর অধিকাংশই হাজতে বিচারবহির্ভুত হত্যাকান্ড, যেগুলোকে প্রায়শই "ক্রসফায়ার" হিসেবে চালিয়ে দেয়া হত। হত্যাকান্ডের শিকার এমন ব্যক্তিদের শরীরে প্রায়ই জখমের চিহ্ন পাওয়া যেত, এ থেকে অনুমান করা যায় যে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল। নতুন সরকার, জানুয়ারী ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর বহু অংশে বিচারবহির্ভুত হত্যাকান্ড কমে আসলেও, গত কয়েক সপ্তাহে এ সংক্রান্ত কিছু নতুন ঘটনা উঠেছে এসেছে। অথচ মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না।

এই প্রতিবেদনে মার্চ ২০০৭ সালে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের একটি দলের হাতে আদিবাসী নেতা চলেস রিচিল এর গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করে মৃত্যুর ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে। ভোলার এক স্থানীয় রাজনীতিবিদ, খাবিরুল ইসলাম দুলাল, নিজ পরিবারের ও প্রতিবেদনের সামনে কিছু অফিসার দ্বারা নির্যাতিত হওয়ায় ঘটনাও এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রই যদিও

প্রত্যদর্শিরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়, তারপরও তাদের করোরই বিচারের মুখোমুখি হতে বা কারাভোগ করতে হয়নি।

এ্যাডামস বলেন, যেইসব বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ঠিক তারাই গুরুতর আইন ভঙ্গের জন্য শনাক্ত। এই কর্মের জন্য ভবিষ্যতে কোন পরিণতি ভোগের ভয় থাকে না তাদের। তিনি আরো বলেন, "র‍্যাব ও সেনা-গোয়েন্দা সংখ্যা ডি. জি. এফ. আই এর মত বাহিনী বা সংস্থা আজ ক্ষমতার অপব্যাবহার ও ইমপিউনিটির প্রতীক হিসেবে দাড়িয়ে আছে।

প্রতিবেদনের উপসংহারেও বলা আছে যে ১৯৭১ সাল থেকে পরবর্তি সকল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার মারাত্নক পর্যায়ের মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করা ও শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রদর্শন করেছে। সমস্যাটির মূলে রয়েছে আইন এবং তার প্রয়োগ। মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগগুলো তদন্ত করার দায়িত্ব একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। তারই সাথে যেসব অপ্রচলিত আইনসমূহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে সেইসব আইনগুলোকেও সংশোধন করা প্রয়োজন। এই প্রতিবেদনটি বর্তমান সরকারকে আহ্বান জানায় যাতে তারা একটি "উইটনেস প্রটেকশন প্রোগ্রাম" বা "সাক্ষী রক্ষাকারী ব্যবস্থা" প্রণয়ন করে এবং এমন ব্যক্তিদের বির"দ্ধে অভিযোগ গঠন অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে যারা কোন ফৌজদারী তদন্তের কার্যক্রমকে থামানো বা বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে।

এই অবস্থার জন্য পুরোনো আইনি অবকাঠামোই দায়ী যা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের আদালতে  অভিযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬, সংসদেরকে ক্ষমতা দেয় এমন আইন তৈরী করতে যার মাধ্যমে সেইসব ব্যক্তিদের দায়মুক্তি দেয়া সম্ভব যারা শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত ছিল। তার সাথে সাথে অনুচ্ছেদ ৪৬ যে কোন দন্ড, সাজা বা শাস্তি মওকুফ করার ক্ষমতাও সংসদকে দেয়।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা থেকেও সেনাসদস্য ও র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) এর অফিসারদের রক্ষা করা হয় এমন নিয়মের আওতায় যার ফলে এসব ব্যক্তিদের বিচার করা সম্ভব শুধুই যখন তাদের উর্ধতন কর্মকর্তা নিজস্ব অভ্যন্তরীন বিচারালয়ে অভিযোগ দায়ের করে। বলার অপেক্ষা থাকে না যে এইসব প্রক্রিয়া যে কোন বিচারেই স্বাধীন বা নিরপেক্ষ নয়।

অপরাধের সঙ্গে জড়িত এমন অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারবৃন্দ, বাংলাদেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে পরলেও তারা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারার কারণে রক্ষা পেয়ে যায়। এই ধারা একজন অফিসারের বির"দ্ধে অভিযোগ দায়ের করা আগে সরকারের কাছে অনুমতি পাওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে ধরে। যেসব ব্যক্তি আইনের আওতায় সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, এমন কথা অন্যান্য আরো আইনে বলা আছে।

বিদেশে সরকারসমূহ এইসব সংস্থা কর্তৃক লংঘনের ব্যাপারে অবগত হলেও, তাদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং ট্রেনিং প্রদান করে।

এ সব কারণের জন্য দেখা যায়, সেনা সদস্য, আধা-সামরিক সদস্য অথবা পুলিশ অফিসারদের আইন ও মানবাধিকারের মানানুযায়ী কাজ করছে কিনা, তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে নিরাপত্তা এবং সামরিক বাহিনীর উর্ধতন অফিসারদের কখনোই কোন শক্তিশালী নিয়মকানুন চাপের

সম্মুখিন হতে হয়নি। তারা ধরেই নেন যে বেআইনি বলপ্রয়োগের স্বাধীনতাও তাদের আছে। তারা ভুক্তভোগীদের এমন ধারণা দেন যে তাদের বিরুদ্ধে কেউ যদি কখনো কোন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালায়, সেই চেষ্টার পরিণতি হবে খুবি ভয়াবহ, এবং নিস্ফল।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকার ইতিমধ্যেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তাদের "জিরো-টলারেন্স" পলিসি বা নীতি ঘোষণা করেছে এবং একই সাথে এও বলেছে যে এইসব কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। তা সত্যেও বর্তমান সরকারকে ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে কোন গুরুত্বহ তদন্তের সূচনা ঘটাতে দেখা যায়নি। এর পর বিডিআর কেন্দ্রীয় দফতরে ঘটে যাওয়া বিদ্রোহ ও নির্বিচারে হত্যার পর সন্দেহজনক বেশ কিছু ব্যক্তির হেফাজতে থাকাকালীন সময় নির্যাতন ও হত্যার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার এই বিষয়ে কোন তদন্তের প্রক্রিয়া চালু করছে না।

ডিজিএফআই এবং র‍্যাব এর সাথে, বিধিবহির্ভুত গ্রেফতার, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভুত হত্যাকান্ডের বহুদিনের এক সম্পর্ক থাকার কারণে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সুপারিশ করেছে ডিজিএফআই ও র‍্যাবকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য। তা সম্ভব না হলে ন্যূণতম বিচারে যাতে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা হয়, সে বিষয়ে হিউম্যান রাইটস্য ওয়াচ সুপারিশ করছে। এই স্বাধীন কমিশনের কাজ হবে এ সকল সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনা করা, মানবাধিকার লংঘনের সাথে জড়িত অফিসারবৃন্দের বরখাস্তের সুপারিশ দান এবং একটি কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে এসব সংস্থার আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির মান বজায় রেখে কাজ করবে।

ডিজিএফআই এর কার্যক্রম কঠোরভাবে আইনানুগ সামরিক গোয়েন্দা কর্মতৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনভাবেই যাতে ডিজিএফআই এই ক্ষমতা দেয়া না হয় যার মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক প্রতিপকক্ষকে অথবা সরকারের সমালোচকদের আটক বা গতিবিধি নজরদারি করতে পারবে।

এ্যাডামস বলেন, "জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি সই করার সুবাদে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সকল মানবাধিকার লংঘন- অতীতে ও ভবিষ্যতে- এর তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখিন করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আছে।" তিনি আরো বলেন, "যেখানে মৌলিক মানবাধিকার সমন্নুত রাখা হয় এবং তারই সাথে গরীব ও পরাক্রমশালীর প্রতি আইনের সমান প্রয়োগ হয়, এমন এক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত হতে চাইলে তাকে অবশ্যই তার ইমপিউনিটির চলমান সংস্কৃতি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।"